ষষ্ঠ অধ্যায়

উপন্যাসগুলিতে নারীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান

> নিউটন গেলিলও অনেক ভাবিয়া বাহ্যিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন এখনো জন্মায় নাই, কবে জন্মাইবে কে জানে?[১]

উক্তিটি স্বর্ণকুমারী দেবী করেছিলেন তাঁর 'মালতী' নামক বড়োগল্পটিতে। মানুষের মন একটি জটিল বিষয়। মনের অন্তর্গহনে যে বিচিত্র সংঘাত ঘটে চলেছে তার রহস্য বোঝা কঠিন। স্বর্ণকুমারীর কর্মবহুল জীবনের একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল তাঁর নারী বিষয়ক ভাবনাচিন্তা। সমকালীন সমাজে মেয়েদের জীবন পরিস্থিতিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছিলেন লেখিকা। সেইসব মেয়েদের না বলা অনেক কথাই ভাষা পেয়েছে তাঁর লেখনিতে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মের বছরই ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে জন্ম হয়েছিল আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের পুরোধা সিগমুন্ড ফ্রয়েডের। বাংলা সাহিত্যে ফ্রয়েডিয়ান প্রভাব এসেছিল বিশ শতকে কল্লোলের সময় থেকে। তারও অনেক পূর্বে উনিশ শতকেই মানুষের অবচেতন মনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এবং জিজ্ঞাসার রহস্য উন্মোচিত হয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসে। 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), 'স্নেহলতা বা পালিতা' (১৮৯২, ১৮৯৩) এবং 'কাহাকে?' (১৮৯৮) উপন্যাস তিনটিতে নারীর অবচেতন মনের রহস্যের যে ইঙ্গিত লক্ষ করা যায় সেই তিনটি উপন্যাসকে নিয়েই এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

কুমারী আর বিধবা এই দুই জায়গা থেকে মেয়েদের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন লেখিকা। প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল'-এ (১৮৭৯) কনকের জীবনের মধ্য দিয়ে সমাজের নির্মম কঠোর রূপটিকে দেখিয়েছেন। পরিবারের অভ্যন্তরে শৈশব থেকেই ছেলেমেয়ের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় এবং তার পরিণতি যে কত করুণ হয়ে উঠতে পারে তা কনকের চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

> লৈঙ্গিক রাজনীতি পুরুষ-নারী-দু'লিঙ্গেরই সম্মতি আদায় করে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পিতৃতন্ত্র পুরুষ ও নারীর জন্যে যে-মেজাজ, ভূমিকা ও অবস্থান স্থির করে, সামাজিকীকরণের ফলে তা মেনে নেয় তারা। পুরুষই শ্রেষ্ঠ, এমন একটি কুসংস্কার বদ্ধমূল ক'রে তোলে পুরুষতন্ত্র, তাই অবস্থানগতভাবে পুরুষ পায় উচ্চমর্যাদা, নারী পায় নিম্নমর্যাদা। পুরুষ তা মেনে নেয় ও ভোগ করে তার জন্ম অধিকার ব'লে, অর নারীও তা বিশ্বাস ও স্বীকার করে।[২]

পরিবারের অভ্যন্তরে লিঙ্গবিভাজনের ফলে দেখা যায় মেয়েরা মনস্তাত্ত্বিক কারণেই পুরুষের অধীনতা মেনে চলতে বাধ্য হয়। সমাজে পুত্রসন্তান বার্ধক্যের ভরসা, বংশরক্ষা ও চিতায় আগুন দেবার যে অধিকার পায়

তার ফলে শৈশব থেকেই তাঁর মনে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে।

> আধিপত্যবাদের সম্পর্ক-বিন্যাস কৃৎকৌশল যুগ-যুগ ধরে পুরুষ ও নারীর অভিজ্ঞান সহ তাদের আত্মবোধ ও বস্তুবিশ্বের মনন-প্রক্রিয়াকে নির্মাণ করেছে। ..., যথাপ্রাপ্ত লৈঙ্গিক অবস্থানের সূত্রে পুরুষ নিশ্ছিদ্রভাবে পীড়নকারী প্রভু আর নারী বিকল্পবিহীনভাবে নির্যাতিত ও অবদমিত।[৩]

কনক বালিকা বয়স থেকেই অনাদরে বড়ো হয়েছে। দাদা প্রমোদের নির্যাতন সহ্য করেও দাদার প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা। কনকের মধ্যে লেখিকা মেয়েদের জীবনের অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিবারে পুত্রসন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও আতিশয্য অন্যদিকে কন্যাসন্তানকে অবহেলা, এই নিষ্ঠুর সত্য আজও সমাজে প্রচলিত। লেখিকা নিপুণভাবে দুটি ভাইবোনের সামাজিক অবস্থানের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের চেহারার বর্ণনায়—

> বালকটি দশমবর্ষীয়, শরীর সুগোল সুঠাম হৃষ্টপুষ্ট, মুখাবয়ব সুন্দর, কৃষ্ণ ভ্রূযুগলের নীচে চঞ্চল চক্ষুর্দ্বয় যেন জ্বলিতেছে, কুঞ্চিত কেশরাশি উন্নত ললাট বেষ্টন করিয়া তাহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছে। মুখশ্রী দেখিলে বালকটিকে সরল উদারচেতা, এবং কিছু উদ্ধত স্বভাব বলিয়া বোধ হয়।
>
> বালিকাটি কিছু কৃশ, ক্ষুদ্র মস্তকে নিবিড় কেশজাল তাহার স্কন্ধদেশের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত আবরিত করিয়াছে; মধ্যে মধ্যে সেই স্থানচ্যুত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি বক্ষে, কপোলে পড়িয়া তাহার সেই গোলাপ কলিকা সদৃশ মুখখানির মধুরতা আরো বৃদ্ধি করিতেছে। তাহার সেই সুদীর্ঘ কেশরঘন চক্ষু দুইটির দৃষ্টি শান্ত ও করুণ, দৃষ্টিতে যেন কেমন সঙ্কুচিত, কেমন সশঙ্কিত ভাব; নেত্রপল্লব যেন কিসের ভারে সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত, তাহাদের যেন সেই দীর্ঘায়তন চক্ষুর সমস্ত আয়তন বিকাশ করিবার সামর্থ্যই নাই। মুখখানি শৈশবের প্রফুল্লভাবে স্ফূর্ত্তিযুক্ত নহে, কেমন যেন ইষৎ বিষণ্ণভাবে আবরিত, পূর্ণিমার জ্বলন্ত উজ্জ্বলতার উপর যেন মেঘের ছায়া পড়িয়া সমস্ত মূর্ত্তিতে একটি ভয়ের ভাব, একটি বিষণ্ণভাব, একটি করুণভাব বিকীর্ণ করিয়াছে।[৪]

মাসি সুশীলার মৃত্যুর পর প্রমোদ যখন কনকের অভিভাবক হয় তখনও তার সেই অধিকারবোধ ও কর্তৃত্ববোধ আরো বেড়ে যায়। কনককে দেখা যায় নীরবে সে দাদার সব অত্যাচার সহ্য করেছে। ভালবাসার পাত্র হিরণকুমারকে ভালবেসেও তাকে বিয়ে করতে পারেনি। কারণ দাদা প্রমোদের হিরণকে পছন্দ নয়। দাদার মতের বিরোধিতা কনক করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর যন্ত্রণার আলোড়ন হয়েছে মনের গভীরে।

> সেও একদিন এই ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছিল — কেন তাহার মত অভাগিনীকে হিরণকুমার তখন বাঁচাইলেন! ... কেবল যাতনার জন্য কি জল হইতে না তুলিলেই ভাল হইত না। এরূপ জ্বলন্ত আগুনে পোড়া অপেক্ষা কি জলে ডুবিয়া মরা ভাল ছিল না?[৫]

এখানে লেখিকা মেয়েদের জীবনের অর্থনৈতিক অসহায়তার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। কনক আর্থিক দিক দিয়ে দাদার উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও অনেক শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী মেয়েদেরকেও দেখা যায় যে পারিবারিক আবেষ্টনী থেকে সহজে বের হয়ে আসতে পারে না। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা। কনক ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান এবং শিক্ষিত। ভাল সেলাই জানত। সেলাই করে বা চাকরি করেও সে নিজের খরচ চালিয়ে নিতে পারত। কারণ 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাস রচনার অনেক পূর্বে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের ব্রাহ্ম মহিলা মনোরমা মজুমদার অনেক বৈরিতার মধ্যে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কনক সেটা করতে পারেনি কারণ, দাদার অনুশাসনকে অতিক্রম করার মত মানসিক বল তাঁর ছিল না।

> নারীপুরুষ মেয়েলি বা পুরুষালি গুণ নিয়ে জন্ম নেয় না জন্মের পরে সমাজ সংস্কৃতির চাপে তারা অর্জন করে মনোলৈঙ্গিক ব্যক্তিত্ব।[৬]

কনক দাদার নির্দয় মনোভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে হিরণকুমারকে বিবাহ করতে পারেনি, কিন্তু দাদার পছন্দের পাত্র যামিনীনাথকে বিয়ে করতেও সম্মত হয়নি।

> ...দাদার অমতে আমি কাজ করতে পারব না, কিন্তু দাদার সহস্র অত্যাচারেও আমি অন্যকে আত্মসমর্পণ করব না।[৭]

কনক শিক্ষিতা। শিক্ষা মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। আর সেজন্যই দাদার অবিচার কনকের অন্তরসত্তাকে বারংবার আলোড়িত করেছে।

> দাদা, অনিচ্ছায় বিবাহ করতে নেই, এ কি তোমার কাছেই শিক্ষা পাইনি। তুমি আজ নিজের কথার ব্যতিক্রম করবে?[৮]

কিন্তু যে আদর্শ পুরুষের ক্ষেত্রে মানায় তা নারীর জন্য কখনও সত্য হতে পারে না।

ভাইয়ের কথায় প্রণয়পাত্র থেকে আত্মসংহরণের পশ্চাতে যে তীব্র মানসিক সংগ্রাম ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কনকের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার মধ্যে। মনের অভ্যন্তরে জমে থাকা ক্ষোভ এবং যন্ত্রণা থেকে হতাশা জেগেছে, এবং অতিরিক্ত হতাশাবোধ থেকেই শেষপর্যন্ত সে পাগল হয়ে গেছে। তারপর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর অচরিতার্থ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

> হিরণকুমার, এ জনমে আর হৃদয়ের সাধ পুরিল না— কিন্তু ঈশ্বর উপাসনার যদি ফল থাকে, বিশুদ্ধ প্রেমের যদি পুরস্কার থাকে, তা হলে মরণে আমার দুঃখ নেই, তা হলে পরলোকে আমাদের মিলন হবেই।[৯]

নিজের অচরিতার্থ বাসনাকে চরিতার্থ করতে চেয়েছে কনক এক কল্পিত লোকে। স্বর্ণকুমারী কনককে এক সহনশীলা আদর্শায়িত নারীরূপে গড়ে তুলেছেন। কনক ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে। বাংলার নারীপ্রগতিতে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরাই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রচলিত সমাজ সংস্কার থেকে কনক নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসে রক্ষণশীলতার প্রভাবকে পুরোপুরি অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। পুরুষশাসিত সমাজে নিজ পছন্দের পাত্রকে বিবাহ করা সম্ভব ছিল না মেয়েদের। স্বর্ণকুমারীর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্ম হলেও বিবাহ ব্যাপারে খুব উদারপন্থী ছিলেন না। তিনি কন্যাদের খুব অল্পবয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রবধূরা ছিলেন কম বয়সি। স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথদের সঙ্গে কোচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবীর কন্যা সুকৃতির বিবাহের বিরোধী ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। প্রথম উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণ' (১৮৭৬) রচনার পর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তেইশ বছর বয়সে স্বর্ণকুমারী 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। তাছাড়া যুগজীর্ণ সংস্কারধর্মী চিন্তার বশ্যতা থেকে স্বর্ণকুমারীও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। তবুও প্রচলিত গণ্ডির বাইরে এসে মেয়েদের আত্মমর্যাদার প্রশ্নে জোরালো যুক্তিবিন্যাস গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হলেও সমাজে তা নিন্দনীয় বলেই বিবেচিত হত; আর বিধবার প্রেম ছিল পাপকর্মের নামান্তর। 'স্নেহলতা বা পালিতা' (১৮৯২, ১৮৯৩) উপন্যাসে নিষ্ঠুর সমাজ পরিমণ্ডলে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর গভীর ভাবনার পরিচয় রয়েছে।

> বাঙ্গালী সমাজে আধুনিকতা প্রবেশের ফলে যেসব সমস্যা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহার একটির যথাযথ ও স্পষ্ট চিত্র স্নেহলতায় আমরা প্রথম পাইলাম।[১০]

উপন্যাসের নায়িকা স্নেহলতা শৈশব থেকেই অসহায় পরাশ্রিতা। কৈশোরেই বৈধব্য এসেছিল স্নেহলতার জীবনে। সমাজে মেয়েদের ক্ষেত্রে 'বিবাহ' শব্দটির উপরই যে তাদের জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করে স্নেহলতার অসহায় জীবন তার প্রমাণ।

আশ্রয়দাতা জগৎবাবুর পুত্র বিপত্নীক চারু বিধবা স্নেহলতাকে বিবাহ করার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল একসময়। সমাজে বিপত্নীক পুরুষের জন্য সামাজিক সুখের কোনো পথই রুদ্ধ নয় কিন্তু বিধবা নারীর জন্য কোনো স্থান নির্দেশিত হয় না। সেজন্য দেখা যায় বিধবা বিবাহের সাময়িক উন্মাদনা থেকে মুক্ত হয়ে চারু সহজেই বালিকা বধূকে বিয়ে করে স্বপ্নলোক রচনা করে, আর বিধবা স্নেহলতা একের পর এক আশ্রয় হারিয়ে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ সমাজকে আলোড়িত করেছিল, ঝড় তুলেছিল বাঙালিসমাজে— কিন্তু সমাজে তা স্বীকৃতি পায়নি। লক্ষ লক্ষ বিধবার মধ্যে গোটা উনিশ শতকে একশোটিও বিধবা বিবাহ হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

> ... ঊনবিংশ শতাব্দীতে যত বিধবাবিবাহ হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি না হলেও প্রায় সমসংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা এই আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ যদিও বিদ্যাসাগরের আন্দোলন ছিল মূলত মানবিক, কিন্তু তাঁর আন্দোলনের সাফল্য আইন প্রণয়নেই সীমাবদ্ধ।[১১]

উনিশ শতকে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিঘ্নস্বরূপ বিদ্যাসাগর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বিধবা বিবাহের উপর। কিন্তু বিধবা বিবাহ নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কতটুকু সহায়ক হবে এ সম্পর্কে কোনো সংশয় তাঁর মনে জাগেনি। কিন্তু উনিশ শতকে বাঙালি সমাজ যুগসঞ্চিত সংস্কার থেকে তখনও মুক্ত হতে পারেনি। সেজন্য বিবাহ সম্পর্কে স্নেহলতাকে বলতে শোনা যায়—

> একবার বিয়ে হলে নাকি আবার বিয়ে হয়![১২]

পিতৃতন্ত্রে সতীত্ব নারীর জন্য প্রথম বিধান। সতীত্বই হচ্ছে নারীত্ব।

> স্নেহলতা এ বিষয়ে যে চিন্তা করিয়া একটা স্থায়ী অটল মত গড়িয়া রাখিয়াছিল তাহা নহে,— তবে সাধারণত হিন্দু কন্যাদিগের যেরূপ হইয়া থাকে, কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াও লৌকিক জনশ্রুতি ও আজন্ম বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহার মনে এ সম্বন্ধে যে একটি আদর্শভাব ছিল— বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ ভাবেরই শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া বিধবামাত্রেরই জীবনে তাহা বরণীয় ইহাই তাহার ধ্রুব বিশ্বাস।[১৩]

কৈশোরে যখন মোহনের সঙ্গে স্নেহলতার বিবাহ হয় তখন প্রেম সম্পর্কে তাঁর কোনোও ধারণা ছিল না। হিন্দু নারীর একমাত্র অবলম্বন তাঁর স্বামী— পিতৃতন্ত্র নারীর মধ্যে যুগ যুগ ধরে এই ধারণাই গ্রথিত করে রেখেছে।

> মাঝে মাঝে কখনো কখনো অকারণে প্রাণে সে একপ্রকার শূন্যতা অনুভব করে সত্য, কিন্তু তখন সে মোহনের ছবিখানি দেখে— তাহার স্নেহের আদরের কথাগুলি মনে করে, শৈশবে ইহার প্রকৃত মর্য্যাদা সে বুঝিত না, এখন মোহনের সেই ব্যবহার, সেই আদর স্মৃতিগ্রথিত করিয়া তাহাকে মনে করিয়া রাখিতে চাহে এবং তাহাই যে ভালবাসে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া জানে।[১৪]

স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী জগৎবাবু স্নেহলতাকে অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীশিক্ষা আন্দোলনের পুরোধারা নারীসুলভ আদর্শ গুণাবলীর বিকাশের জন্যই নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

> এইরূপ সযত্ন-শিক্ষায় স্নেহলতার মনোবৃত্তির প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।... ঈশ্বরের করুণার প্রতি, তাহার মঙ্গলভাবের প্রতি তাহার এত গভীর বিশ্বাস, যে সে বিধবা বলিয়া কেহ যদি তাহার সাক্ষাতে বিধাতার প্রতি দোষারোপ করে, তবে সে সহানুভূতি তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করে না। সে জানে ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাহার রাজ্যে যে অমঙ্গল ঘটে, তাহারও পরিণাম পূর্ণমঙ্গল।... ঈশ্বর স্নেহলতাকে যে অবস্থায় ফেলিয়াছেন অবশ্য তাহার পক্ষে ইহাই মঙ্গলজনক, নহিলে তাহার এ অবস্থা কেন ঘটিবে?[১৫]

পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা নারীর চেতনা এখানে আচ্ছন্ন। বিধবা নারীরও যে যৌন আকাঙ্ক্ষা থাকা স্বাভাবিক একথা তখন ভাবা হত না। চারু স্নেহলতাকে বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা বোঝালে তা তাঁর হৃদয়ধর্মকে নাড়া দেয়।

> মোহনের আসল চেহারা তাহার মনে ছিল না; এই ফটোগ্রাফখানিতে তাহার মানসনয়নে মোহনের একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইত, কিন্তু আজ সে বিশেষ যত্নপূর্বক ছবিখানি নিরীক্ষণ করিয়াও তাহার সেই অস্পষ্ট ছায়া ছায়া মূর্ত্তিখানি মনে আনিতে পারিল না। ছবিখানি দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইতে লাগিল চারুর সহিত ইহার যেন সাদৃশ্য আসিতেছে। স্নেহলতা চোখ বুজিল, মুদ্রিত নয়নের সম্মুখে

চারুর জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইল, চক্ষু খুলিয়া আবার ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল সেখানি স্পষ্ট চারুর ছবি।[১৬]

মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোহনের ছবি অস্পষ্ট হয়ে সে জায়গা দখল করে চারু। একদিকে বৈধব্যের অভিশাপ অন্যদিকে অবদমিত বাসনা এই দুইয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় স্নেহলতার মনে।

... যখন হইতে চারুর জ্বলন্ত আবেগময় প্রেম তাহার নিকট প্রকাশিত হইল, তখন হইতে তাহার হৃদয়ে বিপ্লব বাধিল। সত্যই কি স্নেহকে বিবাহ করতে না পাইলে চারুর সমস্ত জীবন দুর্ব্বহ যন্ত্রণাময় হইবে? এই এক প্রশ্নে তাহার হৃদয় অবসন্ন, পীড়িত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ান্যায় এবং যাহাকে ভালবাসে তাহার সুখের জন্য অন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিবার ইচ্ছা— এই উভয়ের মধ্যে প্রবল সংগ্রাম চলিতে লাগিল।[১৭]

বিধবার প্রেম সমাজে গ্রহণীয় নয়। স্নেহলতার প্রতি চারুর আকর্ষণ স্নেহলতার জীবনকে যে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি দিয়ে লেখিকা তার বর্ণনা করেছেন।

... সেই অনন্ত ভীম অন্ধকারে প্রলয়ের মহাশ্মশান ব্যাপ্যমান! রাশি রাশি শবদেহ বিকট মূর্ত্তিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়া স্নেহকে বেষ্টন করিয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতেছে। কিছুদিন পূর্বে স্নেহ একখানি শ্মশানচিত্র দেখিয়াছিল, সেই চিত্র যেন আজ জ্বলন্ত, জীবন্ত, সত্য। স্নেহ সহজে ভয় পায় না, কিন্তু এই দৃশ্য তাহার নিকট আজ এমন সত্যের মত প্রতিভাত যে এই শীত রাত্রেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, হৃদয় সশব্দে কাঁপিতে লাগিল তথাপি সে মোহমুগ্ধের ন্যায় স্থিরনেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। সহসা সেই অন্ধকার মহাশ্মশানের একস্থান ইষৎ আলোকিত হইয়া উঠিল, ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। স্নেহ দেখিল তাহা চিতালোক, এবং সেই প্রজ্জ্বলন্ত চিতায় এক শবদেহ শয়ান! শবদেহ সহসা উজ্জ্বলরূপ ধারণ করিল, স্নেহ আপনাকে চিনিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল! শবদেহ জ্বলিতে লাগিল, ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, ক্রমে জ্বলন্ত চিতাগ্নিতে বিলীন হইয়া পড়িল![১৮]

পিতৃতন্ত্র নারীর মনোজগতকেও নিয়ন্ত্রণ করে। নারীর কোনো যৌন স্বাধীনতা নেই। নারীর কুমারীত্ব এবং সতীত্বের উপর পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে নারীর শরীর তার নিজের থাকে না। যুগ যুগ ধরে নারী দেখে আসছে সমাজে তাঁর নিকৃষ্ট অবস্থান। তাঁর যে কোনো অপরাধকে বাড়িয়ে দেখে সমাজ। সেজন্য দেখা যায় যে চারুর চুম্বন স্নেহলতার মনে এক অনাবশ্যক অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলে।

আবাল্য ব্রহ্মচর্য্য পালনে যাহার জীবন অতিবাহিত, পরপুরুষ স্পর্শও যাহার সংস্কারে অন্যায় অধর্ম্ম, এরূপ ঘটনায় তাহার জীবনে প্রথম নীতিভঙ্গ, প্রথম পাপ; সুতরাং ভিন্নস্থলে যাহাই হউক এই স্থলে তাহা পুণ্যময় আনন্দ প্রদানের পরিবর্ত্তে কিরূপ অশান্তি, কিরূপ কষ্টের কারণ হইয়া উঠিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।[১৯]

বাল্যবিবাহের ফলে সমাজে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এইসব অসহায় বিধবারা পিতৃগৃহে, শ্বশুরগৃহে অথবা দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে বহুকষ্টে দিন কাটাত। তাদের জীবনের আশা, ইচ্ছে এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনো মূল্য ছিল না। এমনকি পরিবারের অভ্যন্তরে নিকট আত্মীয়ের যৌন লাঞ্ছনারও শিকার হত নিঃসহায় বিধবারা। স্বর্ণকুমারী দেবী স্নেহলতার জীবনের মধ্য দিয়ে মেয়েদের অসহায়তাকে তুলে ধরেছেন। সমাজে পুরুষ এবং নারীর ভাগ্যরেখা যে আলাদাভাবে নির্ধারিত হয় এই নির্মম সত্যের প্রতি তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিধবা বিবাহের উন্মাদনা কেটে যাবার পর চারু বিয়ে করে সংসারী হয়। আর স্নেহলতা জগৎবাবুর আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে স্থান পায় শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু সেখানেও উচ্চশিক্ষিত লম্পট দেওর কিশোরীর লোলুপ এবং নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বাঁচার জন্য জীবনের মায়ের আশ্রয়ে আসে, এবং শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাসের দু'টি ভাগেই সমাজ সচেতনতার চিহ্ন স্পষ্টতর হয়েছে। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, এই সচেতনতার প্রভাব স্নেহলতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। সে তার বৈধব্য এবং তার প্রতি শ্বশুরবাড়ির অবিচারকে ঈশ্বরের বিধান বলেই মনে করেছে। স্বভাবে পুরুষের চেয়ে নারী শ্রেষ্ঠ— একথা সে মেনে নিতে পারে না। জীবনের কথার উত্তরে সে বলেছে—

> ...আমরা তোমাদের পূজার সামগ্রী, না তোমরা আমাদের পূজার সামগ্রী! জ্ঞান বল, হৃদয় বল, আমরা কোন বিষয়েই তোমাদের সমযোগ্য নই। বাস্তবিক আমি যখন ভেবে দেখি— আমি কোন মতেই বুঝে উঠতে পারি নে, পুরুষরা স্ত্রীলোকদের ভালবাসে কেন? তাদের ত এমন কোন গুণই নেই— যাতে তারা তোমাদের আকর্ষণ করতে পারে, তবুও যে তোমরা আমাদের ভালবাস সে কেবল তোমাদের ঔদার্য্য, তোমাদের মহত্ত্ব গুণে।[২০]

পুরুষতন্ত্রের গায়ে যাতে কোনো আঘাত না লাগে ঠিক ততটুকু লেখাপড়াই আশ্রয়দাতা জগৎবাবু স্নেহলতাকে শিখিয়েছিলেন। ফলে স্নেহলতার চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়নি। যুগের হাওয়ায় সে শিক্ষিত হয়েছে ঠিক কিন্তু যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সংস্কারের গণ্ডিকে সে অতিক্রম করতে পারেনি। কোনো প্রতিবাদ, প্রশ্ন এবং হাহাকার তাঁর চরিত্রে লেখিকা দেখাননি। বিধবা ও কুমারী মেয়েরা যে সামাজিক নিষ্পেষনের শিকার হয় সেজন্য সেইসব মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিন 'সখিসমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলার অসহায় বিধবাদের জন্য একটি বিধবাশ্রম স্থাপনের ইচ্ছে ছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর।

> বোম্বাই বিভাগে পণ্ডিতা রমাবাই যেরূপ বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, যে কোনো বিধবা ইচ্ছা করিলেই সেখানে আশ্রয় পাইতে পারেন, সেই অনুকরণে এখানেও একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করা সমিতির প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা।[২১]

স্বর্ণকুমারীর এই আশা ফলবতী হয়েছিল ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হিরণ্ময়ী দেবীর 'বিধবা শিল্পাশ্রম' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অবাক লাগে যখন ভাবনা জাগে তবে স্বর্ণকুমারী কেন স্নেহলতাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুললেন না। স্নেহলতার জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা থাকলে তার জীবনের এমন করুণ পরিণতি হত না। স্নেহলতা

সারাজীবন যাতনা সহ্য করেছে সমাজের, কিন্তু তার মনে একবারও স্বাবলম্বী হবার ইচ্ছে জাগেনি। অথচ 'সখিসমিতি'র উল্লেখ উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রমুখী বসু বেথুন বিদ্যালয়ের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে শরৎ চক্রবর্তী বি.এ অমৃতসরে আলেকজান্দ্রা খ্রিস্টান বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে যান। কামিনী বসুও দেরাদুন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কুমুদিনী খাস্তগীর মহীশূরের মহারানী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। এতগুলো দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও স্বর্ণকুমারী কেন তার উপন্যাসের নায়িকাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ দেখাতে পারলেন না। মনে হয় এক্ষেত্রে তার মধ্যে স্ববিরোধিতা কাজ করেছিল। ঠাকুর পরিবারের মহিলারাই প্রথম বাংলার মেয়েদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন কিন্তু তারা কেউই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত রচনা করেননি। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরানীই প্রথম ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মহীশূরের মহারানী গার্লস স্কুলে চাকুরি করতে গিয়েছিলেন। যদিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী ও সরলার পিতা জানকীনাথ ঘোষাল প্রথমদিকে রাজি ছিলেন না।

আরেকটি প্রসঙ্গ লক্ষনীয়, বিধবার প্রেম এবং বিধবার বিবাহ বঙ্কিমের উপন্যাসে অনেক আগেই দেখানো হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর উপন্যাসে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বিধবা বিবাহ দেখিয়েছেন। কিন্তু স্বর্ণকুমারী তাদের উত্তরসূরী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসে এবং ছোটোগল্পে বিধবার বিয়ে দেখাননি। নীতিবাদী বঙ্কিম সমাজের পক্ষে যে কাজটা হানিকারক মনে করতেন তাকে মৃত্যু দিয়ে মুছে দিতেন। সেজন্য দেখা যায় স্বর্ণকুমারী বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ উপন্যাসে উপস্থাপিত করেও সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে স্নেহলতার সঙ্গে চারুর বিবাহ দেখাতে সাহসী হননি। সেজন্যই নাটকীয়ভাবে বিষ খেয়ে স্নেহলতাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। তবে স্নেহলতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাজের নিষ্ঠুর রূপটিকে তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন পাঠকের সম্মুখে।

বিধবা বিবাহ আইনত সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সমাজের একটা বড়ো অংশ এটা মেনে নিতে পারেনি। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী সাহানা দেবীর পিতা কন্যার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে সাহানাকে এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। সাহানা দেবীর আর বিয়ে হয়নি।

'বিধবা বিবাহ ও হিন্দু পত্রিকা' (১৩১৬) প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী বিধবা বিবাহের সমর্থন করেছিলেন। বিধবা বিবাহ বিরোধীদের অযৌক্তিক মতবাদের বিরোধীতা করে তিনি লিখেছিলেন—

> কোন সমাজের সাময়িক অবস্থা ও সভ্যতা অনুসারে তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তাহাই সমাজের সময়োচিত বিধি বা শাস্ত্র। শাস্ত্র বলিতে চিরন্তন অপরিবর্তনীয় কোনও সমাজ-বিধি বুঝায় না।[২২]

অবাক হয়ে যেতে হয় যে আজ থেকে কত বছর আগে একজন মহিলা শাস্ত্র সম্পর্কে যে আধুনিক এবং যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা ক'জন এই ব্যাখ্যা বুঝি বা মানি। সেজন্য মনে হয় উনিশ শতকে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার যে টানাপোড়েন চলছিল সেই আত্মদ্বন্দ্ব থেকে স্বর্ণকুমারীও নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

'কাহাকে?' (১৮৯৮) উপন্যাসের নায়িকা মৃণালিনী স্বর্ণকুমারীর মানসদুহিতা।

> একুশ শতকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয়তো অবাকই লাগে যে— উনিশ শতক শেষ হবার আগেই, ১৮৯৮ সালে, এক নারী-ঔপন্যাসিকের কলমে লেখা হয়ে গেছে এমন একটি উপন্যাস— ভালোবাসার স্বরূপসন্ধান আর আত্মসচেতন এক অন্বেষণই যার একমাত্র বর্ণনীয় বিষয়।[২৩]

উপন্যাসটিতে নায়িকা মনি বা মৃণালিনীর আত্মকথনের মধ্যে নারীমনের অন্তর্লীন ভাবসম্ভার উন্মোচিত করেছেন লেখিকা। কলকাতার ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের মেয়ে মৃণালিনী সেই সমাজধারায় নিজেকে সমর্পিত করেনি। সচেতন মন নিয়ে সে বিচার করেছে সমগ্র সমাজ এবং পরিবেশকে। সে ইঙ্গ বঙ্গ মেয়েদের থেকে আলাদা। উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় শুধু হৃদয় নয়, তার একটি সক্রিয় মস্তিষ্কও আছে। সেজন্য উপন্যাসের শুরুতে লেখিকা ইংরেজ কবি বায়রনের দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

> Man's love is of man's life a thing apart Tis woman's whole existence.[২৪]

এই পংক্তিটি প্রসঙ্গে মৃণালিনী বলেছে—

> এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি একজন পুরুষ। পুরুষ হইয়া রমণীর অন্তর্গত প্রকৃতি এমন হুবহু ঠিকটি কি করিয়া ধরিলেন, ভারি আশ্চর্য মনে হয়। আমি ত আমার জীবনের দিকে চাহিয়া অক্ষরে অক্ষরে এ কথার সত্যতা অনুভব করি। যতদূর অতীতে চলিয়া যাই, যখন হইতে জ্ঞানের বিকাশ মনে করিতে পারি, তখন হইতে দেখিতে পাই — কেবল ভালবাসিয়াই আসিতেছি, ভালবাসা ও জীবন আমার পক্ষে একই কথা; সে পদার্থটাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে জীবনটা একেবারে শূন্য অপদার্থ হইয়া পড়ে— আমার আমিত্বই লোপ পাইয়া যায়।[২৫]

সমগ্র উপন্যাসে মৃণালিনী 'কাহাকে' ভালবাসে এই সত্যটিকেই খুঁজে ফিরেছে। বিবাহে নারীর স্বেচ্ছা নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বিচার করে নিতে চেয়েছে ভাবী স্বামীর চরিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের আবহাওয়ায় মৃণালিনীর এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। মৃণালিনী যে সমাজের মেয়ে সেই সমাজে বিলেতফেরত পাত্রের সুপাত্র হিসেবে চাহিদা অনেক। কন্যাদায়গ্রস্ত মায়ের উৎকণ্ঠা ও পাত্রের অনুসন্ধান এবং পছন্দমত পাত্রের সঙ্গে কন্যাকে মেলামেশার সুযোগ দান— এসবই সেদিনকার 'এলিট' সমাজে বর্তমান ছিল। মনিকেও এই পরিবেশের মধ্য দিয়েই চলতে হয়েছে কিন্তু তার পরিণত নারীমন যাচাই করে নিতে চেয়েছে ভাবী স্বামীর যোগ্যতা।

> আমার কিন্তু নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, নয়নে আর টিটানিয়ার প্রেমদৃষ্টি নাই, যাহার বলে কুরূপ সুরূপ হইবে, পাপে তাপে, দোষে মলিনতায় কাঁদিয়া তবু তাহাকে আমারি ভাবিতে পারিব। এখন আমার নিরপেক্ষ বিচারক্ষম নবীন হৃদয় উচ্চতর কল্পনাপূর্ণ উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আদর্শে মাত্র জাগ্রত।[২৬]

বিলেতফেরত ব্যারিস্টার রমানাথের সঙ্গে মৃণালিনীর বাগদান যখন প্রায় স্থির, সেইসময় এক বিদেশিনীর সঙ্গে

রমানাথের প্রেম এবং প্রতারণার কথা জানতে পেরে মৃণালিনী অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়। এই আঘাত যে কত ভয়ানক ছিল তা তার জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া থেকেই উপলব্ধি করা যায়। শুরু হয় তার সংকট, কারণ সে নতুন প্রজাতির নারী।

> স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমার বিবাহ হইতেছে, আমি আগ্রহদৃষ্টিতে বরের দিকে চাহিলাম, কিন্তু মনে হইল, এ সে নহে;...[২৭]

মৃণালিনীর ভাবনা চিরাচরিত পথ ধরে অগ্রসর হয়নি।

> সে যেমনই হৌক, তবু আমার দেবতা— তবু তাহার চরণে হৃদয় বিকাইব, মনে এমনতর ভাবেরও উদয় হইল না।[২৮]

স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে তার সমস্ত অন্যায় অবিচারকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার রীতিকে সে সমর্থন করেনি।

> আমি কি করিয়া বুঝাইব যে, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারি, বিবাহ করিতে পারি— তিনি আমার স্বামী হইতে পারেন। কিন্তু আমার হৃদয়ের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে স্থান দিতে গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা ভ্রমক্রমে, মোহভঙ্গে পরিত্যক্ত বিসর্জ্জিত ভগ্ন অঙ্গহীন মূর্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করিলে হৃদয়ের শোভা হইবে না, জীবন পর্যন্ত তাহাতে বিকৃত বিরূপ হইয়া পড়িবে।[২৯]

আবার পরমুহূর্তেই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে—

> রমণীতে এরূপ পৌরুষিক হৃদয়ভাবের কি সহানুভূতি আছে?[৩০]

পিতৃতান্ত্রিক পরিসরে নারী সর্বদাই দূরীকৃত অপর। কিন্তু তবুও মৃণালিনী তার হৃদয়ভাবকে পৌরুষিক' আখ্যা দিয়ে লৈঙ্গিক পার্থক্যকে অস্বীকার করতে চেয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের দাম্পত্যজীবন খুব সুখের ছিল। জানকীনাথ স্বর্ণকুমারীর সকল কাজকর্মে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কবি সরোজকুমারী দেবীকে একটি পত্রে স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন—

> ...এমন স্বামী পাওয়া বহু পুণ্যের ফল; চিরদিন আমার সুখ কিসে হবে তাই দেখেছেন, মৃত্যুর সময়ও আমার কথা ভাবতে ভাবতেই গেছেন, ছেলেমেয়ে আর কাউকে চাননি। এমন স্বামীকে কি করে ভুলবো? তবুও তাকে ছেড়ে বেঁচে আছি,— আশ্চর্য বলেই মনে হয়।[৩১]

স্বর্ণকুমারীর মৃণালিনীকেও তাই বলতে শোনা যায়—

> আমার স্বামীতে আমি সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান গৌরবমণি দেখিতে চাই।[৩২]

উনিশ শতকের ভদ্রলোকেরা 'শিক্ষিতা আদর্শ' স্ত্রী গড়ে তোলার জন্যই মেয়েদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। সেসময়কার অনেক লেখিকা তাদের লেখনীতে ভালো স্ত্রী ও ভালো মা হওয়ার জন্য মেয়েদের উপদেশ দিতেন। লরেটো শিক্ষিতা অভিজাত সমাজের মেয়ে মৃণালিনী কিন্তু জীবনকে দেখে অন্যভাবে। বিবাহ ভেঙে গেলে

মৃণালিনীরই ক্ষতির সম্ভাবনা রমানাথের এই কথার উত্তরে সে নিঃসঙ্কোচে জানায়—

> আমার ক্ষতির জন্য আমি ভাবিনে— আপনারো ভাববার আবশ্যক নেই,— সুবিধার জন্য আমি বিবাহ করতে চাই নে— আপনার সুখ যখন এর উপর নির্ভর করছে না— তখন আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করি।[৩৩]

নব্যশিক্ষিত নারীর সনাতন মূল্যবোধের কাছে অবনত হয়ে থাকাই প্রত্যাশা করে পিতৃতন্ত্র, কিন্তু সেই জায়গায় মৃণালিনীর প্রবল আত্মমর্যাদাজ্ঞান পাঠককে স্তম্ভিত করে দেয়।

রমানাথ ঘোষ ও ডাক্তার বিনয়কুমার এই দু'জন পুরুষই মৃণালিনীর অন্তর্জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে কিন্তু মৃণালিনী নিজেকে উজাড় করে তাদের কারও হৃদয়ে নিজেকে সমর্পিত করেনি। মৃণালিনীর বিশ্লেষণী মন বিচার করে নিতে চেয়েছে ভাবী স্বামীকে।

> মনোজগতের জটিলতা, মানব মনের নানান দুর্মর প্রবৃত্তির সমাবেশে মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রটি স্ফুটতর হয়ে ওঠে। বহিঃজগত অপেক্ষা অন্তঃজগতকে বিশ্লেষণের দিকে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি অধিক। এই ক্ষেত্রে বিষয়ের চেয়ে চরিত্রের প্রাধান্য বেশি, গুরুত্বও বেশি, সূক্ষ্মতার পরিমাণও যথেষ্ট, মনের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ কখনও বা দুরূহও বটে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস এই সূক্ষ্ম বিচিত্রধর্মীতার পটচিত্র অঙ্কনে সক্ষম। 'কাহাকে' উপন্যাসকে বিশ্লেষণের মধ্যে একই রীতি অনুসরণ লক্ষনীয়।[৩৪]

উপন্যাসে একটি সঙ্গীতের আবেশ মৃণালিনীর মনোলোককে অভিসিঞ্চিত করেছে—

> হায়! মিলন হোলো,
> যখন নিভিল চাঁদ, বসন্ত গেলো!
> হাতে ক'রে মালাগাছি, সারাবেলা ব'সে আছি
> কখন্ ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো—[৩৫]

শৈশবে বাল্যসখা ছোটুর মুখে শোনা এই গানটিই যৌবনে বিলেতফেরত রমানাথের প্রতি মোহ জাগে তার মনে। মৃণালিনী তার বাগদত্তা হয়। উপন্যাসে গানের ব্যবহার এক অন্য ভূমিকায়।

> গানটির কি যে মোহ ছিল জানি না, শুনিতে শুনিতে বাল্যের স্মৃতিধারা পূর্ণপ্রবাহে উথলিয়া কুমারী-হৃদয়ের সুপ্ত অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে স্ফীত উচ্ছসিত করিয়া তুলিত। সঙ্গীতধ্বনি সুরে তানে উঠিয়া পড়িয়া যতই মধুরতা বর্ষণ করিত, ততই সে আকাঙ্ক্ষা তীব্র আকুলতর হইয়া প্রবল দ্রুতোচ্ছাসে তাহার চিরপরিচিত অথচ চির-নূতন কে জানে কোন অজানা প্রেমময় সাগর-দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইত— তাহাতে আত্মবিলীন করিতে চাহিত। এই সুমধুর সুকোমল তীব্র অতৃপ্তির আতিশয্যে ক্রমশঃ যেন আপনা হারাইয়া ফেলিতাম, সেই অপরিচিত মধুর গীত-সম্ভাষণে মুগ্ধ স্মৃতিদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া গায়ক ক্রমে আমার মনে নয়নে পরিচিত প্রিয়জনের মূর্তিতে বিভাষিত হইয়া উঠিতেন; নূতনে পুরাতনে, অতীতে-বর্তমানে, স্মৃতি বাসনায় তখন

একাকার হইয়া পড়িত— আমি জাগিয়া যেন স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতাম।[৩৬]

মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, গান বা কবিতার কোনোও কথা বা কোনোও দৃশ্য স্মৃতিকে ধরে রাখতে সহায়তা করে বা বেদনামূলক অতীতকে বারবার মনে পড়ায়। রমানাথের কণ্ঠে শৈশবসখা ছোটুর গাওয়া গানটি মৃণালিনীর মনে ছোটুর স্মৃতি জাগ্রত করেছে।

...আমি সত্যই গায়কের প্রতি আকৃষ্ট হই নাই, আমার অনুরাগ গানের প্রতি।[৩৭]

উত্তমপুরুষে প্রবাহিত হয়েছে এক অন্বেষণের গতিপথ। উনিশ শতকের নারীজাগরণের প্রতিনিধি মৃণালিনী ভালবাসার স্বরূপ সন্ধানে তৎপর। যে সমাজপরিস্থিতি নারীর মনকে বদ্ধমূল সংস্কারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই সমাজমানসিকতাকে অতিক্রম করে আত্মউন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছে মৃণালিনী।

...পুরুষে পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমনি আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।[৩৮]

যে সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে সীতার পাতালপ্রবেশ এবং কুষ্ঠরোগী স্বামীকে গণিকালয়ে বহন করে নিয়ে যাওয়াকে সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয় সেই সমাজে মৃণালিনীর এই ঘোষণা বিপ্লবের ইসতেহার। আর তার দাবি পূরণ করতে পারেনি বলেই রমানাথকে সে গ্রহণীয় মনে করতে পারেনি।

রমানাথের পর মৃণালিনীর জীবনে আসে ডাক্তার বিনয়কুমার। সেখানে গভীর অনুভূতি থাকলেও তোলপাড় হয়েছে তার অন্তর্জগৎ।

ভাবিতে গেলে মহা বিস্ময়ের মধ্যে মগ্ন হইয়া পড়ি! কেবল দুই চারি দিনের দেখা, কেবল দুই চারিটা কথাবার্তা। তাহাতেই কিরূপে আমাকে এমনতর পাগল করিয়া তুলিল; ...তাঁহাকেও ত ভালবাসিয়াছিলাম; কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে এরকমের অনুভাব নহে। সে শুধু গানের মোহ, স্মৃতির ব্যথা; এমন মর্ম বিজড়িত আকুল আকাঙ্ক্ষাময় আত্মদান নহে।[৩৯]

সমগ্র উপন্যাস জুড়েই মৃণালিনীর এই অন্বেষণ চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে পৌঁছে সে পিতার মনোনীত পাত্রকেও বাতিল করে দিতে চেয়েছে। পিতাকে পত্র লিখে নিজের স্বাধীন চিন্তার কথা জানাতে কোনো দ্বিধা করেনি সে।

...আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই; ইহা বালিকার খেয়াল মনে করিবেন না। আমি খুব ভাল করিয়া হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিতেছি, বিবাহে আমার সুখ নাই। ইংলন্ডে ত এমন অনেকেই অবিবাহিতা থাকেন। থাকিয়া দেশের জন্য কাজ করেন, আমিও দেশের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চাই।[৪০]

শুধু বিয়েটাই নারীজীবনের একমাত্র সার্থকতা নয়। উনিশ শতকে বসে স্বাধীন একক জীবনের স্বপ্ন দেখেছে মৃণালিনী। তবে পিতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে যেতে পারেনি। মৃণালিনীর পিতা আধুনিক ভাবাপন্ন পুরুষ মেয়ের অবিবাহিত থেকে জীবন কাটানোকে তিনি সমর্থন করেননি।

স্ত্রীলোকের, ঐহিক পারমার্থিক, সকল প্রকার মঙ্গলের জন্যই বিবাহ শ্রেষ্ঠ পথ। তুমি

> অনভিজ্ঞ অজ্ঞান বালিকা, তোমার কথায় কাজ করে আমি তোমার অমঙ্গলের কারণ হতে পারিনে।[৪১]

উনিশ শতকের প্রগতিশীল পুরুষেরা মেয়েদের শিক্ষিত সংস্কৃত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহের বিকল্পের সন্ধান করেননি। মেয়েদের জীবনের একমাত্র নিরাপত্তা রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক ঘেরাটোপেই। এই ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন তারা। সমষ্টির এই চাপকে মৃণালিনী অতিক্রম করতে পারেননি যদিও তার অন্তর্জগত আলোড়িত হয়েছে।

> দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত অথচ কিছুই চোখে পড়িতেছে না, মস্তিষ্ক চিন্তা তরঙ্গে আলোড়িত, অথচ কি ভাবিতেছি, কিছুই জানি না। মন স্থান হিসাবেও অতি দূরে, সময় হিসাবেও অতিদূরে, নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভব করিতেছি কি, না-করিতেছি, মাঝে মাঝে কেবল সচেতন বেদনার অনুভূতি, দেহবন্ধন হইতে পলায়নের জন্য একটা নিষ্ফল ব্যাকুলতা, অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিবার জন্য নিদারুণ প্রয়াস...[৪২]

সৌভাগ্যক্রমে নিজের পছন্দের পুরুষ ডাক্তার বিনয়কুমার ও পিতার নির্বাচিত পাত্র মৃণালিনীর বাল্যসখা ছোটু উপন্যাসের শেষে একই ব্যক্তিরূপে ধরা দিয়েছে। তবে তাতেও তার পরিণত মনে সংশয় জেগেছে— সে বাল্যসখা ছোটু এবং পরিণত বয়সের প্রেমিক ডাক্তার বিনয়কুমার — পুরাতন আর নতুনে মিলে যাকে বরণ করে নিয়েছে মৃণালিনী তার অতীত না বর্তমান— কোন রূপটাকে সে ভালবেসেছে।

> পুরাতনের ছায়া দেখিয়াই হৃদয় নূতনে আকৃষ্ট হইয়াছে, অথবা নূতনে মুগ্ধ হইয়া সহসা পুরাতন লাভ করিয়াছি? কাহাকে ভালবাসিতে এ কাহাকে ভালবাসিয়াছি?[৪৩]

ভাবতে অবাক লাগে উনিশ শতকের রক্ষণশীল সমাজে একজন শিক্ষিতা অবিবাহিতা নারীকে প্রেমিকা হিসেবে গড়ে তোলার যে অপার সাহস স্বর্ণকুমারী দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। ব্যক্তিসত্তা এক চিরন্তন রহস্য— যার আভাস উপন্যাসটির নামকরণে রয়েছে।

> শতবর্ষ পূর্বের (জুলাই ১৮৯৮) এ কাহিনী 'রোমান্টিক প্রেমকাহিনী মাত্র' নয়, উনিশ শতকের বিশিষ্ট মানসলোক অক্ষয় হয়ে আছে উপন্যাসটিতে। উত্তমপুরুষে রোমান্টিক বাতাবরণে এবং নানান যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে নির্ভার মনের আলাপ আলোচনার সূক্ষ্মতা ফুটে ওঠার মধ্যে একটি নারী হৃদয়-অন্তর্গত অনুভূতির নৈকট্যের উত্তাপ পাঠকের প্রাপ্য হয়ে যায়, যাতে উল্লেখযোগ্য কাহিনীবিন্যাস এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ সময়ের খানিক আগেই যেন অনুভূত হয়...[৪৪]

উনিশ শতকের নবচেতনা নারীর স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার যে অভিজ্ঞানের সূচনা করেছিল সেই সময়কালেই স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর সচেতনতামূলক দিকগুলি নিয়ে লেখনি ধারণ করেছিলেন। আজ এই একুশ শতকেও তাঁর সমাজসচেতন চিন্তাধারা পাঠককে অবাক করে দেয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সেন, অভিজিৎ, ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সংকলক), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৩১।

২. আজাদ, হুমায়ুন, 'নারী', আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃষ্ঠা ২৭।

৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ৫৪।

৪. মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ২৬।

৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৭।

৬. আজাদ, হুমায়ুন, 'নারী', আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃষ্ঠা ২৯।

৭. মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র', দ্বিতীয় খণ্ড, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ১২৮।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১২২।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৩।

১০. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ৯২।

১১. বসু, স্বপন, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ১৪৫।

১২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৬৬৮।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৬৮।

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৬৯।

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৭০।

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৭১।

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৮৬।

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৮৬।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৮৭।

২০. তদেব, পৃষ্ঠা ৭২০।

২১. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৩৪।

২২. ঘোষ, পূর্বাণী (সম্পা.), 'পুরবৈয়াঁ', পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩১।

২৩. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'কাহাকে?', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৭।

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫।

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫।

২৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫।

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৩২।

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৩২।

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫।

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫।

৩১. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', অনুভাব, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১১০।

৩২. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'কাহাকে?', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৩৫।

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭।

৩৪. ঘোষ, পূর্বাণী (সম্পা.), 'পুরবৈয়াঁ', ৯০ বেচু চ্যাটার্জি, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ৬৩।

৩৫. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'কাহাকে?', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২০।

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা ২৬।

৩৭. তদেব, পৃষ্ঠা ২৪।

৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫।

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৩।

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা ৭২।

৪১. তদেব, পৃষ্ঠা ৭২।

৪২. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৩।

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৮০।

৪৪. ঘোষ, পূর্বাণী (সম্পা.), 'পুরবৈয়াঁ', পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬৬।